চিরায়ত বই

২৬

শ্রীকান্ত

শ্রীকান্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

KOBI PROKASHANI

শ্রীকান্ত
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৬৭৫ টাকা

Srikanta A novel by Sarat Chandra Chattopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: June 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 675 Taka RS: 675 US$ 40
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98111-3-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

প্রসঙ্গ-কথা

শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসটি ১৩২২ সালের মাঘ মাস থেকে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। তখন লেখাটি 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' নামে ছাপা হয় এবং লেখকের নাম হিসাবে থাকে 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা'। মাঘ এবং ফাল্গুন এই দুমাস লেখকের নাম ছিল শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা। তার পরের দুমাসে ছিল শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার পর থেকে বরাবর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নামই থাকে।

'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' ১৩২২ সালের মাঘে শুরু হয়ে একটানা ধারাবাহিকভাবে ১৩২৩ সালের মাঘ পর্যন্ত চললে, এই তেরো সংখ্যায় যতটা ছাপা হয়েছিল, ততটা নিয়ে 'শ্রীকান্ত ১ম পর্ব' বই প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকারই মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। প্রকাশের তারিখ—১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭, মাঘ ১৩২৩। এই 'শ্রীকান্ত ১ম পর্ব' প্রকাশের সময় ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' যা বেরিয়েছিল, তার গোড়ার দিকের কিছুটা বইয়ে বাদ দেওয়া হয়।

এরপর 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' আবার 'ভারতবর্ষে' শুরু হয় ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাস থেকে। চলে ১৩২৫ সালের আশ্বিন পর্যন্ত। মাঝে ১৩২৪ সালের আশ্বিন ও কার্তিক এবং ১৩২৫ সালের শ্রাবণ—তিন মাস বন্ধ থাকে। এই আশ্বিন মাস পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাই নিয়ে 'শ্রীকান্ত ২য় পর্ব' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮, ভাদ্র ১৩২৫। প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সই।

'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' তৃতীয় পর্যায় আবার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শুরু হয় ১৩২৭ সালের পৌষ থেকে এবং চলে ১৩২৮ সালের পৌষ পর্যন্ত। এবারেও ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে ১৩২৭ সালের চৈত্র এবং ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে। ১৩২৮ সালের পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে তৃতীয় পর্যায় 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'র নবম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এর শেষ বাক্যটি হলো 'তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেন না,—তেমনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।' এই শেষ বাক্যটির শেষে আগের সংখ্যাগুলোর মতো যথারীতি 'ক্রমশঃ'ও ছিল।

মাসের পর মাস কেটে যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের এই অসমাপ্ত 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'কে আর সমাপ্ত করলেন না।

ভারতবর্ষের মালিক ও সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের অগণিত পাঠক-পাঠিকার অনুরোধ সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' আর লিখলেনই না। না লেখার হেতু, তিনি তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, এবং চরকা ও খদ্দর প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ের 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' ভারতবর্ষে অসমাপ্ত হয়ে পাঁচ বছরেরও বেশি পড়ে রইল। শেষে বাকি আর ছ'টা পরিচ্ছেদ লিখে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে না প্রকাশ করে মোট পনেরো পরিচ্ছেদে একেবারে বই আকারে 'শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব' প্রকাশ করলেন। এই ৩য় পর্ব প্রকাশের তারিখ—১৮ এপ্রিল ১৯২৭, চৈত্র ১৩৩৩। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

'শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব' বই প্রকাশিত হওয়ার পর আরও পাঁচটা বছর কেটে গেল। 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'র চতুর্থ পর্যায় আর ভারতবর্ষে প্রকাশিতই হলো না।

এমন সময় শেষে হঠাৎ দেখা গেল, ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'র বদলে 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব' নামে ছাপা শুরু হয়েছে। এই 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব' বিচিত্রায় একটানা ধারাবাহিকভাবে চলে ১৩৩৯ সালের মাঘ পর্যন্ত। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় বই শেষ করার স্থান, তারিখ ও সময় হিসাবে লেখা ছিল—সামতাবেড়, ২৫শে পৌষ ১৩৩৯। রাত্রি ১১টা।

বিচিত্রায় ঐ বারো সংখ্যায় সমাপ্ত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব নিয়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব' গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৩৩-এর ১৩ মার্চ, চৈত্র ১৩৩৯ তারিখে।

শরৎচন্দ্র ১৩৪০ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে সামতাবেড় থেকে দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'পঞ্চম পর্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ ক'রে দেবো। অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব ভাল হয়নি, তবে থাকলো এইখানেই রথ।'

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব খুব ভালো হয়েছে, দিলীপবাবু এ কথা বলা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত ৫ম পর্ব আর লেখেননি। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব খুব ভালো লেগেছে বলে যে দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, এ কথা দিলীপবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রেরই একটা চিঠি থেকে জানা যায়। তিনি সামতাবেড় থেকে ১৩৪০ সালের ১০ ভাদ্র তারিখে দিলীপবাবুকে লিখেছিলেন—'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভাল লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে,—কারণ, এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন করে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভাল লাগার জন্যেই।'

শুধু শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব কেন, শ্রীকান্তর প্রতিটি পর্বই যে শরৎচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগার জন্য যত্ন করে মন দিয়ে লিখেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তবুও এই শ্রীকান্ত যখন ভারতবর্ষে প্রথম লিখতে শুরু করেন, তখন এই বইটি সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই মনের মধ্যে একটা সংকোচ ছিল, এই বই হয়তো ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপার

অনুপযুক্ত। তাই তিনি তখন রেঙ্গুন থেকে ভারতবর্ষ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' যে সত্যই 'ভারতবর্ষে' ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপান এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেইজন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

"যদি বলেন তো আরো লিখি, আরো অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই। তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

"আমার নামটা কোন মতেই প্রকাশ না পায়। এমন কি আপনি ছাড়া, উপেনবাবু ছাড়া (তাঁর মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—তা ভালই হোক, মন্দই হোক) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছি—এ সব নেই।"

এখানে উদ্ধৃত পত্রাংশটির মধ্যে যে উপেনবাবুর কথা আছে, তিনি হলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন ভারতবর্ষের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। অপর সম্পাদক ছিলেন জলধর সেন। উপেনবাবু হরিদাসবাবুর আত্মীয় ছিলেন।

'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' শ্রীকান্ত ১ম পর্ব নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়, গ্রন্থে, 'ভারতবর্ষে' প্রথমবারের প্রকাশিত অংশটার যে অংশ বাদ দেওয়া হয়, ঐ অংশেই যা ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ছিল।

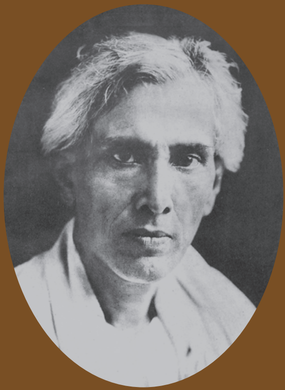

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম।
তাঁর বাল্য-কৈশোর কাটে ভাগলপুরে। শরৎচন্দ্র এফ.এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাঁর বিধিমত লেখাপড়া এখানেই শেষ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে তিনি ঘুরেছেন, ভাগ্যান্বেষণে তিনি ব্রহ্মদেশে যান এবং বারো-তেরো বৎসর রেঙ্গুনে কেরানিগিরি করেন।
১৩১৪ বঙ্গাব্দে—বৈশাখ আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে 'বড়দিদি' নামক গল্প প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠক সমাজে সুপরিচিত হন।
শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক, যদিও কয়েকটি ছোটগল্প এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *বড়দিদি* (১৯১৩)। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *বিন্দুর ছেলে* (১৯১৪), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পণ্ডিতমশাই* (১৯১৪), *মেজদিদি* (১৯১৫), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত* (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *গৃহদাহ* (১৯২০), *পথের দাবী*, *শেষপ্রশ্ন* (১৯৩১) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থই অসামান্য জনপ্রিয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক।
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রীকান্ত
প্রথম পর্ব

এক

আমার এই ‘ভবঘুরে’ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই তো বুড়া হইলাম। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা ‘ছি-ছি’ শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত ‘ছি-ছি-ছি’ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ‘ছি-ছি’র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই ‘ছি-ছি’টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র-সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাড়ি-পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে ‘কাহিনী’ নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না! বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী-লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনি অসঙ্গত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে—সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই তো বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না! সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো

পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে—পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়ো। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দুটি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিনকালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে

না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

ছুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, তুমি? সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাধা কোথাকার!

গাধাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—না।

ছেলেবেলা মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছি—ইতিপূর্বে এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙ্গে নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি? ঐ, ওই দিক থেকে ওরা আসচে—আচ্ছা, তবে খুব ক'ষে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য, সে এতটুকুও হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয়; এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি রে?

শ্রী—কা—ন্ত—

শ্রীকান্ত? আচ্ছা। বলিয়া সে তাহার জামার পকেট হইতে একমুঠা শুকনা পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেছি—চিবো।

কী এ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাসনে? কোথাকার গাধা রে! বেশ নেশা হবে—চিবো! চিবিয়ে গিলে ফ্যাল।

নেশা জিনিসটার মাধুর্য তখন ত আর জানি নাই! তাই ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হ'লে সিগ্‌রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগ্‌রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া

অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগ্‌রেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ রে, সে কি টান! এক টানে সিগ্‌রেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে?

ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

তারপরে মাসখানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বাঁশিতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না। বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গোরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশি বাজায় কে—রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসচে নাকি?

বড়দা বলিলেন, হুঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও-জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন! ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা? ওর শিগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার। তা, সে পথে নদী-নালাই থাক আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।

ধন্যি ছেলে! বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশির সুর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখানি জোর এবং এমনি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অম্‌নি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্চে। তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম, হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিঙ ডিঙাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাশের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এমনি এক সময়ে সে তাহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, পণ্ডিতজী বাড়ি গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই, এবং হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, ইস্কুল হইতে রেলিঙ ডিঙাইয়া বাড়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার শখও তাহার আদৌ ছিল না। এমনকি, মাথার উপর দশ-বিশজন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না! ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; দশ-পনর দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এমনি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার ত এ সাজে নাই বাপু! গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়িতে আসিয়াছিলে—তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ কথা আমাকে লক্ষবার বলিয়াছে; নিজেকে নিজে আমি এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত মন-প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্যপ্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে-সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাশের পড়া'র বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনোটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনোটাতে 'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাকঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ

দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ত তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাশের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চিৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁো-আঁো' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল!—আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখেমুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন? ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদা'র 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা-কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতোই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চিৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।